Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌমিতা আফরিন

রোলঃ 23090121183

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌমিতা আফরিন

রোলঃ 23090121183

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌমিতা আফরিন, আইডিঃ 23090121183 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৌমিতা আফরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মৌমিতা আফরিন

আইডিঃ 23090121183

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

সাওম বা রোজার সংজ্ঞা:.....7

পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে রোজা:.....8

রোজার ফরজ.....11

রোজা যাদের উপর ফরজ.....11

রোজার প্রকারভেদ.....11

রোজার সময়সীমা:.....12

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত.....14

রোজার মাসআলা মাসায়েল.....23

১. চাঁদ দেখার মাসায়েল:.....23

২. নিয়তের মাসায়েল:.....24

সাহরি ও ইফতারের মাসায়েল.....25

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ:.....26

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না.....26

যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে.....29

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে শুধু কাজা আদায় করতে হয়.....30

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হয়.....30

কাফফারার বিধান.....32

যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয়.....33

যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয় না.....34

ছোট বাচ্চার খাবার ও আঠা চিবানের হুকুম.....35

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি মুকিম ও সুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম.....35

গর্ভবতী ও দুধদানকারীর বিধান.....36

রোজার ফিদিয়া আদ◌ায় সংক্রান্ত বিধান 37
ইতিকাফ: 39
যেসব কাজ দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয় 47
মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান 47
ইতিকাফকারীর জন্য যা যা মাকরুহ 48
লাইলাতুল কদর 49
ছদকায়ে ফিতর 50
ঈদের নামাজ এর মাসায়েল 51
রোজাসংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল 52
উপসংহার 56

ভূমিকা

সাওম বা রোজা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামি জীবনধারার একটি অপরিহার্য অংশ। রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় রুকন, যেখানে মুসলিমরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকেন।এটি একটি আত্মসংযম, যা রমজান মাসে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। রোজা কেবল উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য ফরজ নয়, বরং তা অতীত নবী-রাসুলদের উম্মতদের জন্যও ছিল। কিন্তু রোজার সময়, পদ্ধতি ও ধারা ভিন্ন ছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।(আল-বাকারাহ ২:১৮৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،
وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

রোজা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকলেও আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে রোজা রাখাকে ফরজ করেছেন।

মদিনায় দ্বিতীয় হিজরির ১০ শাবান মুমিন মুসলমানের ওপর রমজানের রোজা ফরজ হয়। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰي وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।(আল-বাকারাহ ২:১৮৫)

এরপর থেকেই মুসলিম উম্মাহর ওপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ হয়ে যায়। সে থেকে মুমিন মুসলমান মাসব্যাপী রোজা পালন করে আসছেন।

রোজা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক সংযম শেখায়, যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা বাড়ায়।

কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجم)، وقال : رجاله رجال الصحي

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে

পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

সাওম বা রোজার সংজ্ঞা:

,শব্দটি আরবী, একবচন (الصَّوْمُ) সাওমের অভিধানিক অর্থ: সাওমযার অর্থ হলো বিরত থাকা বা উপবাস থাকা। (الصِّيَام) এর বহু বচন হলোসিয়াম। সাওম

পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার।

ইসলামী পরিভাষায়: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম হলো সাওম বা রোজা।

আবুল হাসান কুদূরী ও জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন-

الصوم إمساك مخصوص في زمان مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة.

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন,

الصوم هو االمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الي غروب الشمس مع النية.

অর্থাৎ সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহকারে পানাহার থেকে বিরত থাকা ।

৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন-

الصوم هو ترك االكل والشرب والوطي من الصبح الي غروب الشمس

অর্থাৎ সাওম তথা রোজা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী - সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে রোজা:

পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকেই রোজার বিধান জারি ছিল। সেই সময়ে রোজা বিভিন্ন প্রকার ছিল, যেমন প্রতি মাসে তিন দিন বা 'আইয়ামে বিজের' রোজা, আশুরার রোজা এবং কিছু নির্দিষ্ট নবীর উপর নির্দিষ্ট সংখ্যক রোজা ফরজ ছিল।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার"। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.)-এর ধর্মে রোজার বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসির গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেই রোজার ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল—তা জানা যায় না। এ বিষয়ে বাইবেল, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আগের যুগের প্রত্যেক নবীর ধর্মেই

চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার বিধান ছিল। এই রোজা আইয়ামে বিজের রোজা নামে পরিচিত।

নূহ (আ.)-এর যুগেও রোজা ছিল। তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে, প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ মুয়াজ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আতা (রহ.), কাতাদা (রহ.) ও দহহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, হজরত নুহ (আ.) থেকে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার বিধান ছিল। পরে তা রমজানের রোজার বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়। (ইবনে কাসির: ১ / ৪৯৭) ; কুরতুবি : ২ / ২৭৫) ; তাবারি: ৩ / ৪১১), তাফসিরুল মানার : ২ / ১১৬) অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, হযরত নূহ (আ.) ১ লা শাওয়াল ও ১০ জিলহজ ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন।-ইবনে মাজাহ ১৭১৪ (সনদ দুর্বল)

মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর যুগে ৩০টি রোজা ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর প্রতি রমজানের ১ তারিখ সহিফা অবতীর্ণ হয়। এ জন্য তিনি রমজানের ১ তারিখ রোজা রাখতেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য ১, ২ ও ৩ রমজান রোজা রাখা ফরজ ছিল। নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তির স্মরণে ১০ মহররম তিনি ও তাঁর অনুসারীদের জন্য রোজা রাখা ফরজ ছিল। কোরবানির স্মরণে ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জসহ মোট সাত দিন ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)-এর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল।

হযরত দাউদ (আ.) এর যুগেও রোযার প্রচলন ছিল। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় থাকতেন।' (মুসলিম: ১১৫৯) অর্থাৎ, নবী দাউদ (আ.) সারা বছর একদিন পরপর রোজা রাখতেন

নবী মূসা, মুসা (আ.)-এর সময়ে রোজা

ইহুদিদের জন্য প্রতি শনিবার, বছরের মধ্যে মহররমের ১০ তারিখে আশুরার দিন এবং অন্যান্য সময় রোজা ফরজ ছিল। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করে ইহুদিদের আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তোমরা কিসের রোজা রাখছ?' তারা বলল, 'এটা সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে বনি ইসরাইল ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) ওই দিনে রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরা

আজ রোজা রাখছি।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আ.)-এর অধিক নিকটজন।’ এরপর তিনি এই দিন রোজা রাখলেন এবং সবাইকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বুখারি: ২০04 ; মুসলিম: ১১৩০)

আসমানি কিতাব ইঞ্জিলপ্রাপ্ত নবী হজরত ইসা (আ.)-এর যুগেও রোজার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসা (আ.)-এর অনুসারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় রোজা রাখতেন। বর্তমানে তাদের মধ্যে দুই ধরনের রোজা প্রচলিত আছে।

প্রথমটি হলো, তাদের পিতার উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা, আর ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে, মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস খাওয়া যাবে না। যেমন— বড় দিনের রোজা, তওবার রোজা, যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারের রোজা। দ্বিতীয়টি হলো— খাদ্য থেকে বিরত থাকা, তবে মাছ ভক্ষণ করা যাবে। এই রোজার মধ্যে ছোট রোজা বা জন্মদিনের রোজা, যা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতগণের রোজা, মারিয়ামের রোজা ইত্যাদি। তবে খ্রিষ্টান ধর্মে কোনো রোজাই ফরজ নয়। (তাফসিরে তাবারি : ৩ / ৪১১)

ইসা (আ.) ধর্ম প্রচারের শুরুতে ইঞ্জিল পাওয়ার আগে জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম সাধনা করেছিলেন। একদিন ইসা (আ.)-কে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেন যে, ‘আমরা অপবিত্র আত্মাকে কী করে বের করব?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘তা দোয়া ও রোজা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।’ (মথি: ৭-৬৬ ; সিরাতুন নবী, ৫ / ২৮৭-২৮৮)

আরববাসীরাও ইসলামের পূর্বে রোযা সম্পর্কে কমবেশী ওয়াকিফহাল ছিল। মক্কার কুরাইশগণ অন্ধকার যুগে আশুরার (অর্থাৎ ১০ মুহররম) দিনে এ জন্য রোযা রাখতো যে, এই দিনে খানা কাবার ওপর নতুন গেলাফ চড়ানো হতো। সেই সময় মক্কা বা মদিনার বাসিন্দারা কেউ কেউ চান্দ্র মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতেন যা হিসাব করলে বছরে ৩৬ দিন হয়। মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরাও পৃথকভাবে আশুরা উৎসব পালন করতো। অর্থাৎ ইহুদীরা নিজেদের গণনানুসারে সপ্তম মাসের ১০ম দিনে রোযা রাখতো।

রোজার ফরজ

রোজার ফরজ ৩ টি। যথা:

১.নিয়ত করা: রোজা রাখার জন্য মনে মনে সংকল্প করা অত্যন্ত জরুরি। এই সংকল্প ছাড়া রোজা হয় না।

২.পানাহার থেকে বিরত থাকা: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল ধরনের পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.সঠিক সময়: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখতে হয়।

রোজা যাদের উপর ফরজ

রোজার কিছু মৌলিক বিধান আছে। প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, বিবেকবান ও মুকিম (নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী) সকল মুসলমানের উপর রোজা ফরজ। অর্থাৎ, যারা এই শর্তগুলো পূরণ করবে তাদের জন্য রোজা রাখা বাধ্যতামূলক।

১.মুসলিম হওয়া : কোনো অমুসলিমের জন্য ইসলামী রীতিতে রোজা পালন অনুমোদিত নয়। অতএব কোনো নওমুসলিমের জন্য ইসলাম গ্রহণের আগের রোজাগুলো কাজা আদায় করা আবশ্যক নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে কোনো মুসলিমের ওপর রোজা ফরজ হয় না। তবে সাহাবিরা শিশুদেরকে রোজায় অভ্যস্ত করতে শৈশব থেকে তাদেরকে রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন।

৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া : পাগল ও জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এমন ব্যক্তির ওপর রোজা ফরজ নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে :১. জাগ্রত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘুমন্ত ব্যক্তি, ২.প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশু ৩.এবং জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত পাগল ব্যক্তি।’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৪০৩; ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি।

৪. ঋতুস্রাব থেকে বিরত থাকা নারী: কোনভাবেই ঋতুবতী নারীর জন্য রোজা রাখা বৈধ নয়।

রোজার প্রকারভেদ

রোজা মোট পাঁচ প্রকার:

১. ফরজ রোজা: ফরজ রোজা বলতে সেই রোজাকে বোঝায় যা প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয়। যেমন: রমজানের রোজা। রমজান মাসের প্রতি দিন

রোজা রাখা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মুসলমানের ওপর ফরজ।রমজানের রোজা দ্বিতীয় হিজরিতে ফরজ করা হয়েছিল। এর আগে, মুসলমানরা আশুরার রোজা ফরজ হিসেবে পালন করতেন, যা রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়।

২. **ওয়াজিব রোজা:** ওয়াজিব রোজা হলো কোনো নির্দিষ্ট রোজা পালনের মানত করলে তা পালন করা, যেমন—শর্তসাপেক্ষে রোজা রাখা বা নফল রোজা ভেঙে ফেললে তা পরবর্তীতে কাজা করা। মানত করা রোজা নির্দিষ্ট দিনে পালন করা আবশ্যক, আর নফল রোজা ভেঙে গেলে তা পরবর্তীতে কাজা করা ওয়াজিব। যেমন:

- মানতের রোজা:মানত করা রোজা: কোনো কারণে রোজা রাখার মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। যেমন, "যদি আমার এই কাজটি হয়, তবে আমি একটি রোজা রাখব" - এই ধরনের মানত।
- নফল রোজা ভাঙলে: কোনো নফল রোজা রেখে কেউ যদি তা ভেঙে ফেলে, তবে ওই রোজার কাজা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, যদি কেউ শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার নিয়তে থাকে এবং তার মধ্যে একটি রোজা ভেঙে ফেলে, তবে সেই রোজাটি কাজা করতে হবে।
- কাফফারার রোজা: কাফফারার রোজা হল একটি নির্দিষ্ট ভুলের জন্য রোজা ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। এটি আদায় করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে:

১. একাধারে ৬০টি রোজা রাখা,

২.৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা ভালোভাবে খাওয়ানো,

৩. অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা।

ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভাঙলে যেমন, কোন কিছু খাওয়া বা পান করা এবং কোনো কারণ ছাড়া রোজা না রাখলে এই কাফফারা ওয়াজিব হয়।

৩. **সুন্নত রোজা:** শবেবরাত ও আশুরার রোজা, আইয়্যামে বীজ এর রোজা।

৪. **মাকরূহ রোজা:** লাগাতার রোজা রাখা।

৫. **হারাম রোজা:** ঈদের দিন ও আইয়্যামে তাশরীকের রোজা।

রোজার সময়সীমা:

রোজার সময়সীমা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। এই সময় একজন রোজাদার সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰي نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَي الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা বাকারা ২:১৮৭)

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। রোযার আরবি শব্দ স াওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় স াওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা ২: ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা ২ : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجم)، وقال : رجاله رجال ال

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্‌বুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন।

প্রত্যেক নেক আমলের জন্য নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, "প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার ৩৯: ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন। হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ।হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ

ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতের পানীয় পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

৫. রোযা মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ দূর্গ হিসেবে কাজ করে।

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে জান্নাতের জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা আনাদের গুনাহের কাফফারা হিসেবে কাজ করে। রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

৯. সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন

সহমর্মিতা ও বদান্যতা: রোজা রাখলে একজন ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট অনুভব করে, যা তাকে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং দানশীল হতে উৎসাহিত করে।

সামাজিক সংহতি: রোজা ও ইফতারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়।

ধৈর্য ও সহনশীলতা: রোজা মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে শেখায়। দৈহিক কষ্টকে সহ্য করার মাধ্যমে এর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০. শারীরিক উপকারিতা

শারীরিক সুস্থতা: নিয়মিত রোজা রাখলে শরীরের হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানো সম্ভব হয়।

শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূরীকরণ: রোজা শরীর থেকে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সাহায্য করে, যা শরীরকে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখে

রোজার মাসআলা মাসায়েল

১. চাঁদ দেখার মাসায়েল:

রমজান মাসে চাঁদ দেখার মাধ্যমে রোজা শুরু করতে হবে।
কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় চাঁদ দেখা গেলে সেই অঞ্চলের সবার জন্য রোজা রাখা আবশ্যক।
তবে, কোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা না গেলে সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের রোজা রাখা নিষিদ্ধ।
শাবান মাসের শেষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা উচিৎ। আার যদি রমজানের শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে।
হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"

"যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ রোজা রাখবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ রোজা ভঙ্গ করবে না, যদি চাঁদ তোমাদের কাছে গোপন থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে"। (বুখারী,মুসলিম)
রাসুলুল্লাহ (সা.) শাবান মাসের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদের অনুসন্ধান করতেন। এমনকি সাহাবিদের চাঁদ দেখতে বলতেন। রমজানের নতুন চাঁদ দেখলে প্রিয় নবী (সা.) কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করতেন।হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন-

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّي وَرَبُّكَ

অর্থ: আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ইমান, শান্তি ও ইসলামের সঙ্গে উদয় কর। আর তুমি যা ভালোবাস এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই

আমাদের তৌফিক দাও। আল্লাহ তোমাদের এবং আমাদের প্রতিপালক।' (তিরমিজি, মিশকাত)

২. নিয়তের মাসায়েল:

সকল কর্মের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে। রোজার নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত না করলে রোজা হবে না। অন্তরের দৃঢ় সংকল্পকে নিয়ত বলে। সুতরাং অন্তরে রোজা রাখার সংকল্প করলেই যথেষ্ট হবে। মুখে রোজার নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরি নয়; তবে উত্তম। হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল(সাঃ) বলেছেন, "সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কেন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যই হয়েছে।"

- লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখা শিরক।
- রোজার নিয়ত মানুষের হৃদয় এর ইচ্ছায় হয়ে যায়।মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।
- ফরজ রোজার নিয়ত ফজরের পূর্বে করা জরুরি। যদি কেউ রাতে নিয়ত না করে তাহলে মধ্য আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার দেড় ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যাবে।
- নফল রোজার নিয়ত দিনে সূর্য ঢলে পড়ার আগে যেকোনো সময় করা যেতে পারে।
- নফল রোজা যেকোনো সময় যেকোনো কারণে ভাঙ্গা যেতে পারে।
- পুরো রমযানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়; বরং প্রত্যেক রোযার নিয়ত পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে। কারণ প্রতিটি রোযা ভিন্ন ভিন্ন আমল (ইবাদত)। আর প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত করা জরুরি।
- রমজান মাসে স‍াহরি খাওয়াটাও রোজার নিয়ত বলে গণ্য হবে। তবে সেহরি খাওয়ার সময় যদি রোজা না রাখার সংকল্প করেন, তাহলে তা রোজার নিয়ত বলে গণ্য হবে না। (ইলমুল ফিক্হ)
- যদি একাধিক রমজানের রোজা কাজা হয়ে যায় তবে কাযা আদায় করার সময় কোন রমজানের রোজা কাজা আদায় করছে সেটা নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে যদি কাজা রোজার সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়

তাহলে জীবনের সর্বপ্রথম কাজা রোজা রাখলাম এভাবেও নিয়ত করতে পারবে।(আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির:১/১১৫)

- যে যে রোজার নিয়ত কাজা করতে হয়: ১.রমজানের কাযা রোজা। ২.অনির্দিষ্ট মান্নতের রোজা। ৩. বিভিন্ন মান্নতের রোজা। ৪. যেই নফল রোজা শুরু করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এসব রোজার নিয়ত রাতে করা আবশ্যক। সুবহে সাদিক এর পর করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাহরি ও ইফতারের মাসায়েল

সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, " তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরীতে বরকত আছে" (বুখারী, মুসলিম)

১.রমজানে ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নত।

২. সাহরি খাওয়া সুন্নাত। ক্ষুধা না থাকলে একটি খেজুর বা এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও সেহরি করা উত্তম।

৩. রাতের শেষ লগ্নে সাহরি খাওয়া সুন্নাত। তবে এত দেরি করা ঠিক নয় যে, রোজা সহিহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

৪.সেহরির সময় জাগ্রত হতে না পারলে, না খেয়েই রোজা রাখতে হবে।

৫.কেউ যদি সময় আছে ভেবে সেহরি খায়, অতঃপর জানতে পারে সেহরি খাওয়ার সময় ছিল না। তবে এই রোজা কাজা করতে হবে, কাফফারা করতে হবে না।

৬.সেহরির শেষ সময় হলো সুবহে সাদিক। সুতরাং সুবহে সাদিকের পর পানাহার করা জায়েজ নেই। চাই আজান হোক বা না হোক।

৭.ইফতার তাড়াতাড়ি করা এবং সাহরি দেরিতে করা নবীগণের সুন্নত।

হাদীস শরীফে আছে,

- لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

যতদিন মানুষ দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।’-সহীহ বুখারী

৮.তাজা খেজুর, শুকনো খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

৯.ইফতারের পর দোয়া পড়া সুন্নত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইফতার করতেন তখন এই দু'আ পড়তেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

বাংলা অর্থ: পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং যদি আল্লাহ চান সওয়াবও স্থির হলো।

১০.রোজাদারকে ইফতার করালে রোজাদারদের সমাব সাওয়াব পাওয়া যায়।

১১.যে ব্যক্তি ইফতার করাবে তার জন্য দু'আ করা উচিৎ।

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. ইচ্ছা করে বমি করা

২. বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা

৩. মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব

৪. ইসলাম ত্যাগ করলে

৫. গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে

৬. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে

৭. রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে

৮. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে

৯. মুখ ভরে বমি করলে

১০. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরও কিছু খেলে

১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে

১২. কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে

১৩. জিহ্বা দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে

১৪. অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে

১৫. রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে। (ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না

এমন কিছু কাজ আছে, যার দ্বারা রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ অনেকে এগুলোকে রোযা ভঙ্গের কারণ মনে করে। ফলে এমন কোনো কাজ হয়ে গেলে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এসব কাজ

পরিহার করতে গিয়ে অযথা কষ্ট ভোগ করে। সুতরাং এসব বিষয়েও সকল রোযাদার অবগত হওয়া জরুরি।

১. অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোজা ভঙ্গ হবে না। তেমনি বমি কণ্ঠনালীতে এসে নিজে নিজে ভেতরে ঢুকে গেলেও রোজা ভাঙবে না। (তিরমিজি: ১/১৫৩)

২. স্বপ্নদোষ হলে, শরীর থেকে রক্ত বের হলে, শিঙ্গা লাগালে রোজা ভঙ্গ হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিনটি বস্তু রোজা ভঙ্গ করবে না: বমি, সিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ। (ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার: ১২৯১)

তবে রক্ত দিলে যদি শরীর দুর্বল হয়ে যায়, এতে রোজা মাকরূহ হবে; কিন্তু রোজা ভঙ্গ হবেনা। (বুখারি ১৯৪০)

অন্য হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় অনিচ্ছাবশত বা বাধ্য হয়ে বমি করবে, তার কাজা করতে হবে না। (আবু দাউদ: ১২৯৪)

৩. সুরমা, কাজল, সুগন্ধি ইত্যাদির দ্বারা রোজার কোন ক্ষতি হয় না। আনাস ইবনু মালিক (রা.) রোজাদার অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। (ফিকহুস সুনান: ১৩০৫)

৪. মশা, মাছি, ধুলাবালি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলা বা পেটে ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'কারো গলায় মাছি ঢুকে গেলে রোজা ভঙ্গ হবে না।' (ইবনু আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ: ৬/৩৪৯)

৫. ভুলে কিছু পানাহার করলে রোজা ভঙ্গ হবেনা। হাদিসে এসেছে, 'যে রোজাদার ভুলে পানাহার করলো, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (মুসলিম: ১১৫৫)

৬.শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। (আবদুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ: ৪/৩১৩)

৭. রোজা অবস্থায় অজ্ঞান, বেহুঁশ বা অচেতন হলে রোজা ভাঙবে না। (সুনানুল কুবরা: ৪/২৩৫)।

৮. রোজা অবস্থায় মিসওয়াক (কাঁচা বা পাকা ডাল যাই হোক) করলে রোজার কোন সমস্যা নেই। এমনকি ইফতারের পূর্বে করলেও অসুবিধা নেই। (বোখারি : ১/২৫৯)।

৯. নাইট্রোগ্লিসারিন-জাতীয় ইনহেলারে রোজা ভাঙবে না, তবে ভেনটোলিন ইনহেলারে রোজা ভেঙে যাবে, কারণ এর কিছু অংশ খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে।

১০. নাকে ড্রপ, স্প্রে ব্যবহারের পর তা যদি গলার ভিতরে চলে যায়, তবে রোজা ভেঙে যাবে। অবশ্য গলায় না গেলে বা স্বাদ অনুভূত না হলে রোজা ভাঙবে না। (মাজাল্লাতু মাজমা‘ইল ফিকহিল ইসলামী : ২/৪৫৪)

১১. খাবার ঠিকঠাক আছে কি না তা বোঝার জন্য ঘ্রাণ নিলে রোজা ভাঙবে না। ইবনু উসাইমীন (রহ.) বলেন, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করলে রোজা ভাঙবে না। যদি গিলে ফেলা না হয়। (রমজান মাসের ৩০ আসর, পৃষ্ঠা: ১৫৫)

১২. রোজা অবস্থায় নখ বা চুল কাটতে কোনো সমস্যা নেই। মেয়েরা হাতে-পায়ে মেহেদী দিলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না।

১৩. সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে রোজা ভাঙবে না। তবে বীর্যপাত হওয়া যাবে না। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজাদার অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমু খেতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তবে, নিজ আবেগ-উত্তেজনার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিলো তোমাদের সবার চেয়ে বেশি। (ফিকহুস সুনান: ১২৯৫)

১৪. রাতে সহবাস করতে কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি সহবাসের পর গোসল না করে সেহরি খেয়ে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর গোসল করলেও সমস্যা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই কাজটি সাব্যস্ত আছে। (ফিকহুস সুনান: ১৩০৪)

১৫. গরমের কারণে, শরীর ঠাণ্ডা করতে একের অধিকবার গোসল করতেও সমস্যা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই কাজটির প্রমাণ আছে। (আবু দাউদ: ২৩৬৫)

১৬. চোখ বা কানের ড্রপ দেয়া।

১৭. ইনহেলার বা অক্সিজেন গ্রহণ।

১৮. মিসওয়াক, টুথব্রাশ বা পেস্ট ব্যবহার অথবা দাঁত ফিলিং করা। তবে এক্ষেত্রে কোনো কিছু গিলে ফেলা পরিহার করতে হবে।

১৯. দেহের কোনো অংশে ক্যাথেটার কিংবা ক্যামেরা প্রবেশ করানো যদিওবা তা মুখ দিয়েও হয়। কেননা তা পানাহার কিংবা এর বিকল্প কিছু নয়।

২০. ক্রিম, তেল, মেকআপ, লিপস্টিক, ঠোঁট আর্দ্রকারী দ্রব্য, সুগন্ধি ব্যবহার।

২১. মুখের লালা কিংবা সর্দি গিলে ফেলা।

২২. কিছু হৃদরোগের ওষুধ/স্প্রে আছে যা জিহবার নিচে রাখা হয়, এ ধরনের ওষুধের কোনো অংশ গিলে না ফেললে তা মুখে রাখা সাওম ভঙ্গকারী নয়।

২৩. রক্ত পরীক্ষা করা।

২৪. কানে পানি গেলে, ধুলা প্রবেশ করলে, ধোঁয়া গলায় গেলে

২৫. স্বপ্নদোষ হওয়া।

২৬. দাঁত হতে রক্ত বাহির হওয়া।

২৭. জুন্ুবী তথা নাপাক অবস্থায় সাহরি খাওযা।

২৮. চোখে ওষুধ লাগানো।

২৯. কেউ মৃত ব্যক্তি বা পশুর সাথে যৌন কাজ করলে।

৩০. ভুলক্রমে যৌন সম্পর্ক করলে।

যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে

১. মুসাফির

মুসাফিরের জন্য সফরের হালতে রোযা না রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে অস্বাভাবিক কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। আর অস্বাভাবিক কষ্ট হলে রোযা রাখা মাকরূহ। এ অবস্থায় রোযা না রেখে পরে তা কাযা করবে।

২. অসুস্থ ব্যক্তি

রোযার কারণে যে রোগ বৃদ্ধি পায় বা রোগ-ভোগ দীর্ঘ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে সে রোগে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ আছে। উল্লেখ্য, আশঙ্কা যদি সুস্পষ্ট হয় তাহলে তো কথা নেই। নতুবা একজন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার চিকিৎসকের মতামতের প্রয়োজন হবে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৩. . গর্ভবতী

রোযা রাখার কারণে গর্ভবতী মহিলা নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানী বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর প্রবল আশঙ্কা করলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। পরে এ রোযা কাযা করে নিবে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৪.দুগ্ধদানকারিনী

দুগ্ধদানকারিনী মা রোযা রাখলে যদি সন্তান দুধ না পায় আর ঐ সন্তান অন্য কোনো খাবারেও অভ্যস্ত না হয়, ফলে দুধ না পাওয়ার কারণে সন্তানের মৃত্যুর বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্কা হয়, তাহলে তিনি রোযা ভাঙ্গতে পারবেন এবং পরে কাযা করে নিবেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, অর্থ : আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোযার হুকুম শিথিল করেছেন এবং আংশিক নামায কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্যও রোযার হুকুম শিথিল করেছেন।-জামে তিরমিযী ১/১৫২; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৫. দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি

বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন গরীবকে দুবেলা খাবার খাওয়াবে অথবা পৌনে দু কেজি গমের মূল্য সদকা করবে।

যে বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করবে।-সূরা বাকারা : ১৮৪

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে শুধু কাজা আদায় করতে হয়

১.স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়
২.ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে
৩.পাথরের কণা, লোহার টুকরা, ফলের বিচি গিলে ফেললে
৪.ডুশ গ্রহণ করলে
৫.বিন্দু পরিমাণ কোন খাবার খেলে তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা মনের ভুলে খেলেও রোজা ভাংবে না তবে মনে আসা মাত্রই খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে
৬.নাকে বা কানে ওষুধ দিলে (যদি তা পেটে পেঁৌছে)
৭.মাথার ক্ষতস্থানে ওষুধ দেওয়ার পর তা যদি মস্তিষ্কে বা পেটে পেঁৌছে
৮.যোনিপথ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সহবাস করার ফলে বীর্য নির্গত হলে
৯.রাত মনে করে সুবহে সাদিক এর পর খাবার খেলে
১০.সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে
১১.মুখে বমি এনে পুনরায় তা প্রবেশ করালে
১২.জোরপূর্বক রোজাদার কে কোন কিছু খাওয়ানো হলে
১৩.দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্য কণা বের করে গিলে ফেললে যদি তা ছোলা বুটের সমান বা তার চেয়ে বড় হয়।
১৪.কুলি করার সময় পেটে পানি চলে গেলে।

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হয়

১. রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোনো খাদ্য আহার করলে অথবা ওষুধ খেলে অথবা সিঙ্গা কিংবা সুরমা লাগানোর পর অথবা গীবত করার পর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত আহার বা পান করলে। (আলমগিরি ১/২০৫ রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৬, ৩৮৮)

এক ব্যক্তি রমজানে রোজা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করল। তখন রাসুলুল্লাহ (স) তাকে একটি দাসমুক্ত করা বা দুই মাস রোজা রাখা বা ৬০ জন মিসকিনকে খাবার দেওয়ার আদেশ করলেন। (সুনানে দারাকুতনি, হাদিস নং: ২/১৯১)

২. প্রিয়জনের প্রিয় থুতু ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে।

৩.ইচ্ছাকৃতভাবে বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি খেলে রোজা ভেঙ্গে যাবপ এবং কাযাও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

৪. দিনের বেলা রোজা রেখে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী মিলন করলে কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে চাই তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক। হাদিসে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা(রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসুল(সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল (সঃ) তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটা গোলাম আজাদ করে দাও। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজি(সঃ) বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল (সঃ) বললেন তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিন কে খাওয়াও।(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১৬৭১)। মুহাম্মদ ইবনে কাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, বিশ্বনবী ঐ ব্যক্তিকে কাফফারা আদায়ের পাশাপাশি ক্যা আদায়ের ও আদেশ দিয়েছিলেন।(মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক)

এ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্ত থাকলে তার ওপরও কাজা-কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রী রাজি না থাকলে বরং তার সঙ্গে জোরপূর্বক করা হলে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। (আলমগিরি ১/২০৫)

ইমাম জুহরি (রহ) বলেন, রমজানে রোজা রেখে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে এর বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারীর বিধানের মতো হবে। অর্থাৎ তাকে কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। (মাবসুত, পৃষ্ঠা: ৩/৭৩; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৬)

৫. কামভাবের সঙ্গে স্ত্রীকে স্পর্শ করল অথবা চুম্বল করল বা আলিঙ্গন করল, তবে বীর্যপাত হয়নি, কিন্তু সে মনে করল, রোজা ভেঙে গেছে। ফলে ইচ্ছাকৃত পানাহার করল, তা হলে তার ওপর কাজা এবং কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৫৫৮)

৬. কেউ গোঁফে তেল লাগালো আর মনে করল রোজা ভেঙে গেছে, অতঃপর ইচ্ছাকৃত আহার করল, তা হলে তার ওপর কাজা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে। (বাদায়িস সানায়ে ২/২৫৮)

৭. বিনা ওজরে একই রমজানে এক বা একাধিক রোজা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে একটি কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর রোজাগুলো একাধিক রমজানের হলে প্রত্যেক রমজানের জন্য এক একটি করে কাফফারা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুখতার: ৩/৩৯১)

৮.সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খানাপিনা করলে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে কাযা-কাফফারা দু’টোই জরুরি হবে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰي نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَي الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।(-সূরা বাকারা২ : ১৮৭;) মাআরিফুল কুরআন ১/৪৫৪-৪৫৫

কাফফারার বিধান

১. একটি কৃতদাস আজাদ করা। (এখন যেহেতু দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে, তাই বাকি দুভাবেই কাফফারা আদায় করতে হবে)

২. লাগাতার ৬০টি রোজা রাখবে।

৩. অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে অথবা ৬০ জন মিসকিনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ গম, আটা, চাল ইত্যাদি অথবা সমপরিমাণ নগদ টাকা দিবে। একজন মিসকিনকে ৬০ দিন দু বেলা খাওয়ালে ও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী ১/৩০৫, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯০)

হযরত আবু হুরায়রা(রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসুল(সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল (সঃ) তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটা গোলাম আজাদ করে দাও। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজি(সঃ) বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল (সঃ) বললেন তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিন কে খাওয়াও।(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১৬৭১)। কাফফারার রোজা রাখতে গিয়ে কোন কারণবশত ১/২টি রোজা রাখতে না পারলে পুনরায় ৬০টি রোজা রাখতে হবে। তবে পিরিয়ডের কারণে নারীরা লাগাতার রোজা রাখতে না পারলে পিরিয়ড শেষ হওয়া মাত্রই রোজা রাখা শুরু করবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯০)

যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয়

১. রোজাদারের জন্য মিথ্যা বলা, গিবত করা, অশ্লীল কাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, গালিগালাজ করা, গান শুনা, সিনেমা, ভিডিও দেখা মাকরুহ।

২.কোনো প্রয়োজন ও কারণ ছাড়া কোনো কিছু চিবানো, তরকারি বা কোনো খাবারের স্বাদ আস্বাদন করা মাকরুহ।

৩.রোজা রেখে অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অনেক বেশি পানি নেওয়া মাকরুহ।

৪. রোজা রেখে মুখের ভেতর থুথু জমা করে গিলে ফেলা মাকরুহ।

৫. সহবাসের পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে চুমু দেওয়া মাকরুহ।

৬.টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত মাজা মাকরুহ। আর পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজার সময় তা পেটে চলে গেলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

৭.দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকলে শিঙা লাগানো মাকরুহ।

৮.সন্দেহযুক্ত সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরি খাওয়া মাকরুহ।

৯.সেহরি ও ইফতার ছাড়া ধারাবাহিকভাবে একাধিক দিনের রোজা রাখা মাকরুহ।

১.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোঁয়া, ধুলাবালি, মশা, মাছি চলে গেলে। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৬)
২. তেল, সুরমা, শিঙা লাগালে হলকে তার স্বাদ পেলে। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৬)
৩. স্বপ্নদোষ হলে রোজা ভাঙে না। (তিরমিজি, হাদিস ৭১৯)

৪.যেকোনো সময় মেসওয়াক করলে রোজা মাকরুহ না। সেটি কাঁচা হোক কিংবা শুষ্ক। (আলমগিরি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯)

৫ কাঠি দিয়ে কান খোঁচানোর ফলে কোনো ময়লা বের হলে তারপর ময়লাযুক্ত কাঠি বারবার কানে প্রবেশ করালে। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৭)
৬.রোজা অবস্থায় সাধারণ ইনজেকশন বা টিকা লাগানো বৈধ। তবে এমন ইনজেকশন বা টিকা লাগানো মাকরুহ, যেগুলো দ্বারা রোজার কষ্ট বা দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। (জাওয়াহিরুল ফিকাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৯)
৭.সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করলে রোজা মাকরুহ হয় না। (আল-ফিকহুল হানাফি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৪; মাহমুদিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৯)
৮.ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত বের করলে রোজা নষ্ট হবে না। আর দুর্বলতার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও হবে না।
৯. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুতুতে লাল আভা থেকে যায়, তাহলে রোজা মাকরুহ হবে না। (এমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩১)

১০.ভেজা কাপড় শরীরে দেওয়া অথবা ঠাণ্ডার জন্য কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া অথবা গোসল করা মাকরুহ নয়। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৪; দারুল উলুম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪০৫)
১১. স্বপ্নে কিংবা সহবাসে যদি গোসল ফরজ হয়ে থাকে এবং সুবেহ সাদিকের আগে গোসল না করে রোজার নিয়ত করে, তাহলে তার রোজার মধ্যে অসুবিধা হবে না। (জাওয়াহিরুল ফিকাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮০)
১২. গরমের দরুন দীর্ঘক্ষণ পানিতে অবস্থান করা মাকরুহ নয়। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

১৩. গলা খাঁকারি দিয়ে গলদেশ থেকে মুখে কাশি বের করা, তারপর আবার গিলে ফেলা মাকরুহ নয় (এরূপ না করাই উচিত)। (শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩)
১৪. রোজা অবস্থায় মাথা বা চোখে ওষুধ দেওয়া মাকরুহ নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড ২)
১৫.রোজা অবস্থায় নাকের মধ্যে ওষুধ ব্যবহার করার দ্বারা ব্রেনে না পৌঁছলে রোজা মাকরুহ হয় না। (মাহমুদিয়া, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৬৯)
১৬. হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ঘ্রাণ নেওয়া মাকরুহ নয়। (মাহমুদিয়া, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৮০)
১৭. রোজা অবস্থায় পাইপ দ্বারা মুখে হাওয়া নিলে রোজা মাকরুহ হয় না। (মাহমুদিয়া, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৮০
১৮.শরীরে কোনো ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বা রক্ত প্রবাহিত হলে বা রক্ত বের করলে রোজা নষ্ট হয় না। তবে রোজাদার থেকে বের করা মাকরুহ। (জাওয়াহিরুল ফিকাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮)
১৯.ডাক্তার যদি চিকিৎসার শুকনো কোনো যন্ত্র পেটে প্রবেশ করায়, অতঃপর তা বের করে ফেলে, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না। (আল-ফিকহুল হানাফি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭১২)
২০. পানিতে ডুব দেওয়ার পর কানের ভেতর পানি চলে গেলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পানি দিলে রোজা মাকরুহ হয় না। (বিনায়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৪; আলমগিরি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৪; শামি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

ছোট বাচ্চার খাবার ও আঠা চিবানের হুকুম

কোন রোজাবীহিন লোক থাকা অবস্থায় রোজা আদায়কারী মহিলা তার বাচ্চার খাবার চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ। তবে কোন রোজাবিহীন লোক না থাকলে চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ হয়। তবে খুব সতর্কভাবে চিবাতে হবে যেন খাবারের কোন অংশ গলায় চলে না যায়। আর আঠা জাতীয় বস্তু চিবালে রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা তা দাঁতের সাথে জড়িয়ে থাকে।গলায় প্রবেশ করে না।

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি মুকিম ও সুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম

মুসাফির ব্যক্তি সুস্থ হয়ে কিছু দিন বেঁচে থেকে মৃত্যু বরণ করলে অথবা মুসাফির ব্যক্তি একামত করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে আর সে কাযা আদায় করেনি তাহলে সে যে কয়দিন সুস্থ বা একামত অবস্থায় ছিল সে কয়দিনের কাযা ওয়াজিব হবে।

সুতরাং তার মৃত্যু কালে উক্ত দিন সমূহের ফিদিয়া আদায় করার জন্য ওসিয়ত করে গেলে তার মাল সমূহ থেকে ফিদিয়া আদায় করা তার ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব হবে। আার অসিয়ত না করলে ওয়াজিব হবে না বরং মুস্তাহাব হবে।

গর্ভবতী ও দুধদানকারীর বিধান

দুগ্ধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়ের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়েয।

২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়েয আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরূহ। বরং কোন কোন আলেম উল্লেখ করেছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলেন:

"এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরূহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করেছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী যদি নিজের গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়েয হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা না করেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।"

দুগ্ধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়ের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়েয।

২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়েয আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরূহ। বরং কোন কোন আলেম

উল্লেখ করেছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলেন:

"এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরূহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করেছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী যদি নিজের গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়েয হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা না করেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।" সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সিয়াম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলেন:

যদি গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী শারীরিকভাবে সবল ও কর্মোদ্যমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপরি কোন ওজর ছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?তিনি উত্তরে বলেন:"গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারীর জন্য কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা না-রাখা জায়েয নয়। যদি ওজরের কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রেণীর নারী অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। যদি এ দুই শ্রেণীর নারীর ওজর হয় 'তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা' তাহলে কোন কোন আলেমের মতে, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে গম, চাল, খেজুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলেমের মতে, কোন অবস্থাতে তাদেরকে কাযা পালন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। কারণ খাদ্য প্রদানের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলিল নেই। আর দলিল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা- মৌলিক বিধান। এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ও মজবুত অভিমত।"

রোজার ফিদিয়া আদায় সংক্রান্ত বিধান

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। জটিল ও কঠিন হয়ে যাবে এমন বিধানও ইসলাম দেয়নি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না' (সুরা বাকারা : ২৮৬)। আরও বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কাঠিন্য রাখেননি' (সুরা হজ : ৭৮)। তাই রোজার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ, রোগাক্রান্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিকল্প হিসেবে ফিদিয়ার বিধান রেখেছেন। তবে যেকোনো ধরনের অসুস্থতা কিংবা অক্ষমতার

অজুহাতেই রোজা না রেখে ফিদিয়া দেওয়ার সুযোগ নেই বরং অসুস্থতা ও অক্ষমতার অবস্থাভেদে হুকুমের ভিন্নতা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। জটিল ও কঠিন হয়ে যাবে এমন বিধানও ইসলাম দেয়নি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না' (সুরা বাকারা : ২৮৬)। আরও বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কাঠিন্য রাখেননি' (সুরা হজ : ৭৮)। তাই রোজার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ, রোগাক্রান্ত ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিকল্প হিসেবে ফিদিয়ার বিধান রেখেছেন। তবে যেকোনো ধরনের অসুস্থতা কিংবা অক্ষমতার অজুহাতেই রোজা না রেখে ফিদিয়া দেওয়ার সুযোগ নেই বরং অসুস্থতা ও অক্ষমতার অবস্থাভেদে হুকুমের ভিন্নতা রয়েছে। ইসলামে রোজার বিকল্পে ফিদিয়া আদায়ের জন্য অসুস্থতাকে দুই প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রকার এমন অসুস্থতা, যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। এমন সাময়িক অসুস্থতার দরুন রোজা রাখা সম্ভবপর না হলে রোজা না রাখার অবকাশ রয়েছে বটে। কিন্তু এর জন্য ফিদিয়া দেওয়া জায়েজ হবে না বরং এমন ব্যক্তি রোগমুক্তির অপেক্ষা করবে। সুস্থ হওয়ার পর ওই রোজাগুলো কাজা করে নেবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে কিংবা সফরে থাকবে, তা হলে অন্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে' (সুরা বাকারা : ১৮৪)। আর দ্বিতীয় প্রকার এমন স্থায়ী রোগ, যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না এবং এমন বয়োবৃদ্ধ ও মাত্রাতিরিক্ত দুর্বল, যার ভবিষ্যতে কখনো রোজা রাখার সমর্থ ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য মাহে রমজানে রোজা রাখা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হলে রোজা না রাখার অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে রোজার বিকল্প হিসেবে তারা ফিদিয়া আদায় করতে পারবে।

ফিদিয়া প্রযোজ্য হবে দুর্বল, বৃদ্ধ ও এমন অসুস্থ ব্যক্তি-যার ভবিষ্যতে রোজার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যাদের জন্য রোজা ভাঙা জায়েজ আছে, (যেমন মুসাফির, গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিণী) তারা রোজা না রাখলে রোজার ফিদিয়া দেবে না বরং পরে কাজা করবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গর্ভবতী নারী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিণীর জন্য রমজানে রোজা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তারা ফিদিয়া আদায় করবে না বরং রোজাগুলো কাজা করে নেবে' (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ৭০৬৪)। আর ওজরের হালতে মৃত্যুবরণ করলে কাজা ও ফিদিয়া কিছুই ওয়াজিব হবে না।

অবশ্য ওজরের হালত শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ মুসাফির মুকিম হওয়ার পর, গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ও স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এবং স্তন্যদানকারিণী স্তন্যদান বন্ধ করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তা হলে ওজর শেষে যে কয় দিন সময় পেয়েছে সে কয় দিনের কাজা জিম্মায় আসবে। কাজা না করতে পারলে মৃত্যুর পূর্বে ওই দিনগুলোর ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত করে যেতে হবে। (দুররুল মুখতার : ২/৪২৩-৪২৪)। আর অসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে ফিদিয়া দেয়, তবে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন। তবে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করে গেলে সে ক্ষেত্রে মিরাসের এজমালি সম্পদ থেকে ফিদিয়া দেওয়া হবে না। একান্ত দিতে চাইলে বালেগ ওয়ারিশরা তাদের অংশ থেকে দিতে পারবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/২০৭)

যাদের জন্য রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা রমজানের শুরুতেই পুরো মাসের ফিদিয়া দিয়ে দিতে পারবে। (দুররুল মুখতার : ২/৪২৭)। ফিদিয়ার হকদার গরিব-মিসকিনরা, যারা জাকাতের হকদার। ফিদিয়া কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, যেখানে জাকাতের হকদার আছে, সেখানেও দেওয়া যাবে। (আল ইনায়াহ : ২/২৭৩)। এক রোজার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও ফিদিয়া আদায় হবে। আর একাধিক ফিদিয়া এক মিসকিনকে দেওয়া জায়েজ। ফিদিয়ার পরিমাণ হচ্ছে, প্রতিটি রোজার পরিবর্তে এক সদকাতুল ফিতর-যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম-আটা বা তার সমমূল্যের অন্য কোনো বস্তু বা নগদ টাকা। (ফাতহুল মুলহিম : ৩/১৫)। ফিদিয়ার টাকা মসজিদ-মাদরাসা বা অন্য কোনো সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সরাসরি গরিবের হাতে দিতে হবে

ইতিকাফ:

ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।এর সময় ১০ দিন। সাধারণত এটি রমজানের শেষ ১০ দিনে পালন করা হয়ে থাকে।

ইতিকাফ আরবী শব্দ। যার অর্থ হল, অবস্থান করা, অভিমুখী হওয়া, নিবেদিত হওয়া, নিরবচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি।

পরিভাষায় ইতিকাফ হল, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে গুটিয়ে, এমন মসজিদে অবস্থান করা, যেখানে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ।

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১২৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩।

ইতিকাফ তিন প্রকার :

১. সুন্নত ইতিকাফ।

রমযানের শেষ দশকে একুশ তারিখের রাত (অর্থাৎ ২০ তারিখ সূর্যাস্তের আগ)থেকে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফ করা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এ দিনগুলোতে ইতিকাফ করতেন, তাই একে সুন্নত ইতিকাফ বলা হয়।

২. নফল ইতিকাফ।

রমযানের শেষ দশকে পূর্ণ দশ দিনের কম ইতিকাফ করা। অথবা বছরের অন্য যেকোনো সময় যতক্ষণ ইচ্ছা, ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা।

৩. ওয়াজিব ইতিকাফ।

মান্নতকৃত ইতিকাফ এবং সুন্নত ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করা।

ইতিকাফের স্থান: সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদে হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদে আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ।তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের স্থান হল ঘরের নির্দিষ্ট

কোনো স্থান। (দ্র. শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৪৭০; মাবসূত, সারাখসী ৩/১১৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮০-২৮১; রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৯)

ইতিকাফের প্রস্তুতি: ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মানুষ যেহেতু আল্লাহর ঘর মসজিদে আসে, সেজন্য মানবীয় সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূত-পবিত্র। আল্লাহর ঘর সর্বোচ্চ সম্মানিত ও পবিত্রতম স্থান। তাই প্রথমে নিজের বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করা উচিত। স্মরণ করা উচিত কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত-

يٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ.

হে আদম-সন্তানেরা! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভা অবলম্বন করবে (অর্থাৎ পোশাক পরে নেবে)। -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৩১

এই আয়াতে পোশাক পরে তাওয়াফ ও নামায আদায়ের নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উত্তম পোশাক পরার কথাও। যে পোশাক পবিত্র ও সুন্দর এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভাবর্ধনকারী। [দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪০৫; তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৩৯২] পাশাপাশি নিজের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া কাম্য। কেননা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ছাড়া বাহ্যিক পবিত্রতা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফায়েদা লাভ করা যায় না। সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে একটি আয়াতে -

يٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکُمۡ لِبَاسًا یُّوَارِیۡ سَوۡاٰتِکُمۡ وَ رِیۡشًا وَ لِبَاسُ التَّقۡوٰی ذٰلِکَ خَیۡرٌ .

হে আদম-সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং (ব্যবস্থা করেছি) সাজ-সজ্জার বস্তু। তবে তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। -সূরা আরাফ (৭) : ২৬

অর্থাৎ বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের দেহকে আবৃত করে রাখে, তেমনি তাকওয়ার পোশাক মানুষের গোনাহপ্রবণ স্বভাবকে আবৃত করে রাখে। আর দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের প্রতিফল- উভয়ক্ষেত্রেই তাকওয়ার পোশাক বেশি উপকারী। (দ্র. তাওযীহুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের টীকা)

এরপর নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের জন্য যতটুকু সামানা না হলেই নয়, সেটুকু নিয়ে আসা। কোনো সামানাপত্রের বিষয়ে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়- সেই দিকটিও খেয়াল রাখা। মসজিদে যতক্ষণ থাকা হয়, ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে এ বিষয়েও খুব গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

এমনকি পেঁয়াজ, রসুন এবং এজাতীয় গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেলে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে

নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে। (দ্র. সুহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অহেতুক কথাবার্তা ও উঁচু আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। মসজিদে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮)

মসজিদে অবস্থানকালে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরে থাকাই কাম্য। সেইসাথে নিজে পরিপাটি হয়ে থাকা এবং সামানাপত্র পরিপাটি করে রাখা। [দ্র. সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১]

সর্বোচ্চ আবেগ ও আগ্রহের সাথে মসজিদ পরিষ্কার রাখা উচিত। একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ পেশ করা হয়েছে। তখন তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- মসজিদের কফ-থুথু (ময়লা-আবর্জনা) পরিষ্কার না করা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৫৩

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। -সূরা বাকারা (২: ১২৫)। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩

ইতিকাফের প্রস্তুতি: ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মানুষ যেহেতু আল্লাহর ঘর মসজিদে আসে, সেজন্য মানবীয় সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূত-পবিত্র। আল্লাহর ঘর সর্বোচ্চ সম্মানিত ও পবিত্রতম স্থান। তাই প্রথমে নিজের বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করা উচিত। স্মরণ করা উচিত কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

হে আদম-সন্তানেরা! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভা অবলম্বন করবে (অর্থাৎ পোশাক পরে নেবে)। -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৩১

এই আয়াতে পোশাক পরে তাওয়াফ ও নামায আদায়ের নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উত্তম পোশাক পরার কথাও। যে পোশাক পবিত্র ও সুন্দর এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভাবর্ধনকারী। [দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪০৫; তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৩৯২] পাশাপাশি নিজের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া কাম্য। কেননা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ছাড়া বাহ্যিক পবিত্রতা থেকে কাক্সিক্ষত ফায়েদা লাভ করা যায় না। সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে একটি আয়াতে -

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ .

হে আদম-সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং (ব্যবস্থা করেছি) সাজ-সজ্জার বস্তু। তবে তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। -সূরা আরাফ (৭) : ২৬

অর্থাৎ বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের দেহকে আবৃত করে রাখে, তেমনি তাকওয়ার পোশাক মানুষের গোনাহপ্রবণ স্বভাবকে আবৃত করে রাখে। আর দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের প্রতিফল- উভয়ক্ষেত্রেই তাকওয়ার পোশাক বেশি উপকারী।

মোটকথা, আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার আগে প্রথম কাজ হল, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। তওবার মাধ্যমে নিজের অতীত গোনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষা করে থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং কায়মনোবাক্যে দুআ করা।

এরপর নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের জন্য যতটুকু সামানা না হলেই নয়, সেটুকু নিয়ে আসা। কোনো সামানাপত্রের বিষয়ে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়- সেই দিকটিও খেয়াল রাখা।সেইসাথে ইবাদতের চিন্তা ও মানসিকতা ধারণ করা। ধ্যান ও মনকে আল্লাহ-অভিমুখী করা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তকে জাগরূক করা।

মসজিদের থাকার কিছু আদব: মসজিদ আল্লাহর ঘর। এ ঘরের মর্যাদা দুনিয়ার সকল ঘর থেকে বেশি। এ জায়গার সম্মান অন্য সকল জায়গার চেয়ে অধিক। হাদীস শরীফে এসেছে-

أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ। সবচাইতে অপ্রিয় জায়গা বাজার। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭১

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু এই পবিত্র মর্যাদাপূর্ণ স্থানেই অবস্থান করে, তাই এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদার কথা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা উচিত।

হাদীস শরীফে মসজিদকে পবিত্র রাখার বিষয়েও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (দ্র. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৫)

তাই নিজের কারণে যেন মসজিদে কোনো অপবিত্রতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সযত্ন খেয়াল রাখা।

মসজিদে যতক্ষণ থাকা হয়, ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে এ বিষয়েও খুব গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

এমনকি পেঁয়াজ, রসুন এবং এজাতীয় গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেলে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে। (দ্র. সুহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অহেতুক কথাবার্তা ও উঁচু আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। মসজিদে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮)

মসজিদে অবস্থানকালে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরে থাকাই কাম্য। সেইসাথে নিজে পরিপাটি হয়ে থাকা এবং সামানাপত্র পরিপাটি করে রাখা। [দ্র. সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১]

সর্বোচ্চ আবেগ ও আগ্রহের সাথে মসজিদ পরিষ্কার রাখা উচিত। একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ পেশ করা হয়েছে। তখন তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- মসজিদের কফ-থুথু (ময়লা-আবর্জনা) পরিষ্কার না করা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৫৩

ইতিকাফে বিশেষ করণীয়: ইতিকাফের সময় বান্দা যেহেতু মসজিদে থাকে, তাই মসজিদের যাবতীয় আদব রক্ষা করে থাকা উচিত। পুরো সময় সতর্কতার সাথে থাকা উচিত, যেন কোনো ধরনের কোনো গোনাহ না হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত আমলগুলোর ব্যাপারে খেয়াল রাখা।

১.মসজিদের প্রধান আমল হল, জামাতের সাথে ফরয নামায আদায় করা। তাই সর্বোচ্চ গুরুতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায় করা।

২.ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু দুনিয়াবি সকল কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এসময় থেকেই খুশু-খুযূকে অভ্যাসে পরিণত করা।

৩.রমযান মাসে প্রতিটি আমলের আজর ও সওয়াব অন্য সকল সময়ের চেয়ে বেশি। সেজন্য অধিক পরিমাণে নফল ইবাদতের চেষ্টা করা।বিশেষ করে সুন্নত ইতিকাফ যেহেতু রমযান মাসে হয়ে থাকে, সেজন্য রমযান ও রোযার যাবতীয় হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

৪. সব সময় কোনো না কোনো ইবাদতে মগ্ন থাকা। তবে অন্যের ইবাদত বা ঘুম-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে, এমন উদ্যোগ পরিহার করা।যেমন কেউ নামায পড়ছে কিংবা পাশেই বিশ্রাম করছে, সেসময় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

৫.বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কোনো কথা না বলা।একান্ত প্রয়োজনে কথাবার্তা হলে নম্রতা, কোমলতা ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলা।

৬.কারো সাথে কোনো কটু কথা না বলা। ঝগড়া-তর্ক তো সব সময়ই মন্দ কাজ। মসজিদে, রমযান মাসে এবং ইতিকাফরত অবস্থায় সেটা আরো মন্দ কাজ। অতএব সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৭.অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। সালাফে সালিহীনের রমযান-কেন্দ্রিক কুরআন তিলাওয়াতের ঘটনাগুলো স্মরণ করা। সে অনুযায়ী বেশি থেকে বেশি কুরআন খতমের চেষ্টা করা। অর্থসহ তিলাওয়াত করা উচিৎ। অন্তত কিছু সময় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের তরজমা, তাফসীর খেয়াল করে করে পড়া।

৮.নফল নামাযের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। কিছু নফল নামায তো বিভিন্ন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন ইত্যাদি। সাধারণ সময়ে নানা কর্মব্যস্ততার দরুন নিয়মিত এ নামাযগুলো আদায় করা হয় না। ইতিকাফের দিনগুলোতে যেন এর কোনোটি না ছোটে সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

৯.এছাড়াও সালাতুল হাজত, সালাতুশ শোকর, সালাতুত তওবা এবং অন্যান্য নফল নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

১০.দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদাবিশিষ্ট নামাযেরও বিভিন্ন ফযীলত রয়েছে। সেজন্য ইতিকাফের সময় এভাবে দীর্ঘ নামাযের প্রতিও মনোযোগী হওয়া।

১১.জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার কারণে হাদীসে বর্ণিত অনেক যিকির ও তাসবীহ নিয়মিত আদায় করার সুযোগ হয় না। এছাড়াও বুযুর্গদের আমলে যিকিরের যেসব কালিমা ও পরিমাণের কথা পাওয়া যায়, সেগুলোও সুযোগমতো আদায় করার চেষ্টা করা। যেমন, ছয় তাসবীহ, বারো তাসবীহ ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

১২.ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থানই একটি স্বতন্ত্র নেক আমল। অতএব তিলাওয়াত,যিকির ও অন্যান্য আমলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কিংবা কিছুক্ষণ শুধু নীরবতাও অবলম্বন করা যায়। অনর্থক গল্প-কথাবার্তার চেয়ে সেটিই বেশি উত্তম।

১৩.এ সময় নির্বাচিত কিছু দ্বীনী কিতাবও অধ্যয়ন করা যায়। ইতিকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল এবং বুযুর্গদের ইতিকাফ ও রমযানের আমল বিষয়ক কিতাবও মুতালাআ করা যায়।

নারীদের ইতিকাফ: নারীদের ইতিকাফ এর নিয়ম হল, তারা নিজ বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদতের জন্য অবস্থান করবেন। ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নিতেমহবে।এবং মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় ইতিকাফ ভেঙে দিতে হবে। শিশু তত্ত্বাবধান ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব থাকলে সে ইতিকাফে না বসাই সমীচীন। ইতিকাফে থাকাকালীন অযথা কথাবার্তা ও কাজ এড়িয়ে চলতে হবে এবং ইবাদত, যেমন - নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরে মনোনিবেশ করতে হবে। ইতিকাফকারী নারীর জন্য খাবার পৌঁছে দেওয়ার লোক না থাকলে প্রয়োজনে বাইরে খাবার আনতে যেতে হবে। পানাহার ইতিকাফ এর জায়গায় করতে হবে। বাইরে করা যাবে না।

যেসব কাজ দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয়

১.ইতিকাফের স্থান থেকে ইসলামসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে গেলে তবে ইসলামসম্মত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে বের হওয়া যায়।
২. স্ত্রী সহবাস করলে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে হোক।
৩.সহবাসের আনুষঙ্গি কাজ যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যৌন মিলন করো না যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)
৪. এ ছাড়া পাগল হয়ে গেলে, নারীদের হায়েজ-নেফাস হলে এবং কেউ ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হলে ইতিকাফ ভেঙে যায়।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান

১. ইতিকাফকারী যদি বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয় তাহলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।
২. আর ইতিকাফের স্থান থেকে যদি মানবীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য বের হয় তাহলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না।
৩. মসজিদে থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।
৪. বাহক না থাকার কারণে ইতিকাফকারীকে যদি পানাহারের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয় অথবা মসজিদে খাবার গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ হয়, তাহলে এরূপ প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে।
৫. যে মসজিদে ইতিকাফে বসেছে সেখানে জুমার নামাজের ব্যবস্থা না থাকলে জুমার নামাজ আদায়ের প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব এবং আগেভাগেই রওনা হওয়া তার জন্য মুস্তাহাব।
৬. ইসলামসমর্থিত ওজরের কারণে ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারে।
৭. কোনো নেকির কাজ করার জন্য ইতিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। যেমন রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত হলো, রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাজায় অংশ

গ্রহণ না করা, স্ত্রী স্পর্শ না করা এবং সহবাস না করা এবং খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মসজিদ থেকে বের না হওয়া।' (আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৭৩)

৮. ইতিকাফ-বিরুদ্ধ কোনো কাজের জন্য ইতিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি।

ইতিকাফকারীর জন্য যা যা মাকরুহ

ইতিকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে সওয়াব হয়, এই মনে করে চুপ থাকা মাকরুহে তাহরিমি। বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরুহে তাহরিমি। যেমন কেনাবেচা করা ইত্যাদি। তবে একান্ত প্রয়োজনবশত, যেমন: ঘরে খাবার নেই এবং সে ছাড়া অন্য কোনো বিশ্বস্ত মানুষও নেই—এরূপ অবস্থায় মসজিদে মালপত্র উপস্থিত না করে কেনাবেচার চুক্তি করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহিমান্বিত আমলে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইতিকাফকে কবুল করুন এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসীলা করুন। ইতিকাফের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

লাইলাতুল কদর

রমজান মাসে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এই রাতে পবিত্র কুরআন মাজীদ নাজিল হয় এবং এই রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এই রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, আন্তরিক দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এই রাতটি বিশেষভাবে বরকতময়, রহমত ও ক্ষমার সুযোগ এনে দেয় এবং রমজানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে এটি খোঁজা হয়।

বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কদর। আল্লাহ বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ রাতে রয়েছে যেমন বরকত তেমনি কল্যাণ ও তাৎপর্য। বরকতের প্রধান কারণ হল এ রাতে আল-কোরান নাজিল হয়েছে। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সিদ্ধান্ত লওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করা হয় বাস্তবায়নের জন্য। এ রাতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

‘নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে। তোমাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সে রাত ফজরের সূচনা পর্যন্ত। (সূরা কদর: ১-৫)

আল-কোরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোন রাত। তবে কোরআনের ভাষ্য হলো লাইলাতুল কদর রমজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে। এবং এ রজনী রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে হবে বলে সহিহ হাদিসে এসেছে। এবং তা রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদিসে এসেছে।

আল-কোরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোন রাত। তবে কোরআনের ভাষ্য হলো লাইলাতুল কদর রমজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে। এবং এ রজনী রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে হবে বলে

সহিহ হাদিসে এসেছে। এবং তা রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদিসে এসেছে।

লাইলাতুল কদর উপলক্ষে আমাদের করণীয়

ক. কদরের ফজিলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু নফল ইবাদত করা, নফল নামাজ আদায় করা। কোরআন তেলাওয়াত করা, তাছবীহ তাহলীল পাঠ করা কর্তব্য।

খ. লাইলাতুল কদর হলো বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো ক্ষমা চাওয়ার দোয়া। এ রাতে মহানবী (সা.) ক্ষমা চাওয়ার দোয়া শিক্ষা দিলেন যে, তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, ক্ষমা পাওয়ার জন্য দোয়া করো। হাদীস শরীফে আছে হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ! যদি আমি বুঝতে পারি শবে কদর কোন রাত, তাহলে ঐ রাতে আমি কি বলব? আল্লাহর কাছে কি চাইব? প্রিয় নবী (সা.) তদুত্তরে বলেন তুমি বলবে, 'হে আল্লাহ আপনি বড়ই ক্ষমাশীল। ক্ষমা করতে আপনি ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।

গ. এ রাতের আরেকটি আমল ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেন যে, এ রাতে ইবাদাতের পূর্বে যদি কেউ গোসল করে নিতে পারে তার সেটাই উত্তম। উক্ত আমলগুলো শুধু ২৭ রমজান নয় বরং রমজানের শেষ দশ দিনের প্রত্যেক বেজোড় রাতে শবেকদর তালাশ করতে হবে। এজন্য মহানবী (সা.) রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করতেন। আর উম্মতের জন্য শরীয়তে ইতেকাফের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত জারি রেখে গিয়েছেন যেন তারা ইতেকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি বেজোড় রাতে এবাদত করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা লাইলাতুল কদরে কোরআন নাজিল করেন। এ রাত বছরে একবার আসে আর চলে যায়। কিন্তু এ রাতের মহান নিয়ামত কোরআন মানব সমাজেই বিরাজমান থাকে চিরদিন।

ছদকায়ে ফিতর

১. ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ।

২.ছদকায়ে ফিতর এর উদ্দেশ্য রোজা অবস্থায় সংগঠিত গুণাহসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

৩. ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজ এর আগে আদায় করতে হবে অন্যথায় সাধারণ সদকায়ে পরিণত হয়। ৪.সদকায়ে ফিতর এর অধিকারী তারাই যারা যাকাতের অধিকারী।

৫. ছদকায়ে ফিতর এর পরিমাণ এক ছা

৬. সদকায়ে ফিতর সকল মুসলমান এর উপর আদায় করা ফরজ। সে গোলাম হোক বা আজাদ, পুরুষ হোক বা নারী, ছোট হোক বা বড়, রোজাদার হোক বা গায়রে রোজাদার,নেসাব এর মালিক হোক বা না হোক সবার উপর ফরজ। তবে যে ব্যক্তির কাছে একদিন এক রাতের খোরাক নেই তাকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে না।

৭. সদকায়ে ফিতর ফসল দিয়ে দওয়া উত্তম।

৮. গম, চাউল, যব, খেজুর, মোনাক্কা পনির ইত্যাদির মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় তাই দেওয়া উত্তম।

৯.ছদকায়ে ফিতর ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পরিবার এর সবার পক্ষ থেকে আাদায় করে দিতে হবে

ঈদের নামাজ এর মাসায়েল

১.যাদের উপর জুমার নামায ফরয, তাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব। অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, যেসকল মুসলিম পুরুষ, জামাতে উপস্থিত হয়ে ঈদের নামায আদায়ের সক্ষমতা রাখে তাদেরকে ঈদের নামায পড়তে হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ২/৪৭৬; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭; শরহুল মুনইয়া, পৃ. ৫৬৫

২.মহিলাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। অনুরূপ এমন অসুস্থ পুরুষ, যে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে ঈদের নামায আদায়ের সক্ষমতা রাখে না, তার উপরও ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। -কিতাবুল আছল ১/৩২৩; মাবসূত, সারাখসী ২/৪০; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৪৮৫; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭

৩.মুসাফির তথা যে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কি. মি. দূরত্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে- এমন ব্যক্তির উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি ঈদের নামায পড়ে তাহলে তা সহীহ হবে এবং এর সওয়াবও পাবে। -আততাজরীদ, কুদুরী ২/৯৮১; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৭; আযযাখীরাতুল বুরহানিয়া ২/৩৯৬

৪.হজ্বের সফরে থাকা লোকদের জন্য ঈদুল আযহার নামাযের বিধান নেই। -আযযাখীরাতুল বুরহানিয়া ২/৩৯৪

৫.ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে- সূর্য উদিত হয়ে (নামাযের) নিষিদ্ধ সময় শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু করে যাওয়াল তথা সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার আগ পর্যন্ত। এ

সময়ের মধ্যেই ঈদের নামায পড়তে হবে। যাওয়ালের পর আর ঈদের নামায সহীহ হবে না। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৩৫; আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া, পৃ. ৬৫; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৪৭৭; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৯

৬. ঈদের নামায ঈদগাহে ও খোলা মাঠে পড়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সকলেই ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلّى.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের নামাযের জন্য) ঈদগাহে যেতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬৫

রোজাসংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল

১. মস্তিষ্কের অপারেশন: রোজা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করে ঔষধ ব্যবহার করা হোক বা না হোক রোজা ভাঙ্গবে না। (আল মাকালাতুল ফিকহীয়া)

২. কানে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

কানে ঔষধ, তেল ইত্যাদি ঢুকালে রোজা ভেঙ্গে যাবে। তবে গোসল করার সময় অনিচ্ছায় যে পানি কানে ঢুকে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন পানি গলায় না চলে যায়। (আল মাকালাতুল ফিকহীয়া)

৩. চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

চোখে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করার দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় অনুভব হয়। (হেদায়া)

৪. নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

নাকে পানি বা ঔষধ দিলে যদি তা খাদ্যনালীতে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। (ফতওয়ায়ে রাহমানিয়া)

৫.অক্সিজেন ব্যবহার

রোজা অবস্থায় ঔষধ ব্যবহৃত অক্সিজেন ব্যবহার করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। তবে শুধু বাতাসের অক্সিজেন নিলে রোজা ভাঙ্গবে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

৬. মুখে ওষুধ ব্যবহার

মুখে ঔষধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে বা ঔষধের অংশ বিশেষ গলায় প্রবেশ করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। গলায় প্রবেশ না করলে রোজা ভাঙ্গবে না। (ফতওয়ায়ে শামী)

৭. সালবুটামল, ইনহেলার ব্যবহার: শ্বাসকষ্ট দূর করার লক্ষ্যে তরল জাতীয় একটি ঔষধ স্প্রে করে মুখের ভিতর দিয়ে গলায় প্রবেশ করানো হয়, এভাবে মুখের ভিতর ইনহেলার স্প্রে করার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে। (ইমদাদুল ফতওয়া)

৮. এনড্রোস্কপি

চিকন একটি পাইপ, যার মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি বস্তু থাকে। পাইপটি পাকস্থলিতে ঢুকানো হয় এবং বাইরে থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। এই নলে যদি কোনো ঔষধ ব্যবহার করা হয় বা পাইপের ভিতর দিয়ে পানি/ঔষধ ছিটানো হয়ে থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি কোনো ঔষধ লাগানো না থাকে তাহলে রোজা ভাঙ্গবে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

৯. নাইট্রোগ্লিসারিন

এরোসল জাতীয় ঔষধ, যা হার্টের জন্য দুই-তিন ফোঁটা জিহŸার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে। ঔষধটি শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ঔষধের কিছু অংশ গলায় প্রবেশ করার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। অতএব ,এতে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

১০. এনজিওগ্রাম

হার্ট বøক হয়ে গেলে উরুর গোড়া দিয়ে কেটে বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে হার্ট পর্যন্ত যে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার নাম এনজিওগ্রাম। এ যন্ত্রটিতে যদি কোনো ধরনের ঔষধ লাগানো থাকে, তারপরেও রোজা ভাঙ্গবে না।

১১. রক্ত দেওয়া ও নেওয়া

রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করলে বা শরীরে প্রবেশ করালে রোজা ভাঙ্গবে না। (আহসানুল ফতওয়া)

১২. লেপারোসকপি: শিক্ জাতীয় একটি যন্ত্র দ্বারা পেট ছিদ্র করে পেটের ভিতরের কোনো অংশ বা গোশত ইত্যাদি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। এতে যদি ঔষধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে, অন্যস্থায় রোজা ভাঙ্গেব না। (আল মাকালাতুল ফিকহীয়া)

১৩. সিস্টোসকপি: প্রসাবের রাস্তা দিয়ে ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে যে পরীক্ষা করা হয় এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। (হেদায়া

১৪. প্রক্টোসকপি: পাইলস, পিসার, অর্শ, হারিশ, বুটি ও ফিস্টুলা ইত্যাদি রোগের পরীক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। মলদ্বার দিয়ে নল প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষাটি করা হয়। রোগী যাতে ব্যথা না পায় সে জন্য নলের মধ্যে গিøসারিন জাতীয় কোনো পিচ্ছিল বস্তু ব্যবহার করা হয়। নলটি পুরোপুরি ভিতরে প্রবেশ করে না। চিকিৎসকদের মতানুসারে ঐ পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে মিশে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে, ভেতরে থাকে না। আর থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে। যদিও শরীর তা চোষে না কিন্তু ঐ বস্তুটি ভিজা হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (ফতওয়া শামী)

১৫. কপার-টি: কপার-টি বলা হয় যোনিদ্বারে প্লাস্টিক লাগানোকে, যেন সহবাসের সময় বীর্যপাত হলে বীর্য জরায়ুতে পৌঁছাতে না পারে। এ কপার-টি লাগিয়েও সহবাস করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। কাযা কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে।

১৬.'সিরোদকার অপারেশন: সিরোদকার অপারেশন হলো অকাল গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্বে সেলাই করে মুখকে খিচিয়ে রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। যেহেতু এতে কোনো ঔষধ বা বস্তু রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি স্থানে পৌঁছে না তাই এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না

১৭. ডি এন্ড সি: ডি এন্ড সি হলো গর্ভধারণের আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে উরষধঃড়ৎ এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করে নিয়ে আসা। এতে রোজা ভেঙ্গে যাবে। অযথা এমন করলে কাযা কাফফারা উভয়টি দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে। (হেদায়া)

১৮. এম আর: এম আর হলো গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে এম আর সিরিঞ্জ প্রবেশ করিয়ে জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ নিয়ে আসা। যার পর ঋতুস্রাব পুনরায় হয়। অতএব, মাসিক শুরু হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু যদি রাতের বেলা করা হয় তাহলে দিনের রোজা কাযা করতে হবে না। (ফতহুল কাদীর)

১৯.আলট্রাসনোগ্রাম: আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষায় যে ঔষধ বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সবই চামড়ার উপরে থাকে, তাই আলট্রাসনোগ্রাম করলে রোজা ভাঙ্গবে না। (হেদায়া)

২০. স্যালাইন: স্যালাইন নেয়া হয় রগে, আর রগ যেহেতু রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়, তাই স্যালাইন নিলে রোজা ভাঙ্গবে না, তবে রোজার কষ্ট লাঘবের জন্য স্যালাইন নেয়া মাকরূহ। (ফতওয়ায়ে দারুল উলুম)

২১. টিকা নেয়া: টিকা নিলে রোজা ভাঙ্গবে না। কারণ, টিকা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তায় ব্যবহার করা হয় না। (আপকে মাসায়েল)

২২. ঢুস: ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই ঢুস নিলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। ঢুস যে জায়গা বা রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে এ জায়গা বা রাস্তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য স্থান। (ফতওয়ায়ে শামী)

২৩. ইনসুলিন গ্রহণ করা: ইনসুলিন নিলে রোজা ভাঙ্গবে না। কারণ, ইনসুলিন রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

২৪.দাঁত তোলা: রোজা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন হলে দাঁত তোলা জায়েজ আছে। তবে অতি প্রয়োজন না হলে এমনটা করা মাকরূহ। ঔষধ যদি গলায় চলে যায় অথবা থুথু থেকে বেশি অথবা সমপরিমাণ রক্ত যদি গলায় যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (আহসানুল ফতওয়া)

২৫. পেস্ট, টুথ পাউডার ব্যবহার করা: রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় টুথ পাউডার, পেস্ট, মাজন ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরূহ। কিন্তু গলায় পৌঁছালে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল)

২৬. মিসওয়াক করা: শুকনা বা কাঁচা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজার দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। চাই যখনই করা হোক না কেন। (ফতওয়ায়ে শামী)

২৭.নকল দাঁত মুখে রাখা: রোজা রেখে নকল দাঁত মুখে স্থাপন করে রাখলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। (ইমদাদুল ফতওয়া)

২৮. ডায়াবেটিসের সুগার মাপার জন্য সুঁচ ঢুকিয়ে যে একফোঁটা রক্ত নেয়া হয়, এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না

২৯. রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দিলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে খুব বেশি পরিমাণে রক্ত দিলে, যাতে শরীরে দুর্বলতা আসে, তা মাকরূহ।

উপসংহার

রোজা এমন একটি ইবাদত যা মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দেয়, তাকওয়া অর্জনে সাহায্য করে এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভে সহায়তা করে। রোজার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তি দমন হয়, ঈমান দৃঢ় হয় এবং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র করার সুযোগ তৈরি হয়। এটি তাকওয়া অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম এবং ঈমানদারদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।রোজা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রোজা সম্পর্কিত এক হাদিসে বলা হয়েছে, "রোজা আমার জন্য, এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব," যা এর আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে তুলে ধরে।রমজানের রোজা পূর্বের সব পাপকে মুছে ফেলতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি এই মাস পেয়েও পাপ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে গণ্য করা হয়।রোজা মানুষকে পানাহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনে এবং তার আত্মাকে পবিত্র করে। রোজা রাখলে একজন ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট অনুভব করে, যা তাকে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং দানশীল হতে উৎসাহিত করে।পবিত্র রমজানের রোজা শুধু একটি ধর্মীয় বিধান নয়, বরং এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও শারীরিক উন্নয়নের এক সমন্বিত পথ। এই মাসে রোজা রেখে একজন মুমিন তার জীবনকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। তাই রোজা মত এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত করার জন্য এর মাসআলা মাসায়েল গুলো জানা অতীব জরুরি। মাসআলা মাসায়েল গুলো জানার মাধ্যমে আমরা রমজানের মধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধান করতে পারি। ইবাদত সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক পন্থায় করতে পারি।

তথ্য সূত্র:

1.https://www.dainikamadershomoy.com/details/018e64734966

2.https://m.dailyinqilab.com/article/373657/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE

৩. "পূর্বের নবীদের সময়ের রোজা যেমন ছিল" https://www.ajkerpatrika.com/islam/ajpcvqntlop4z

৪. "মাসিক আলকাউসার - কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত" https://www.alkawsar.com/bn/article/642/